পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

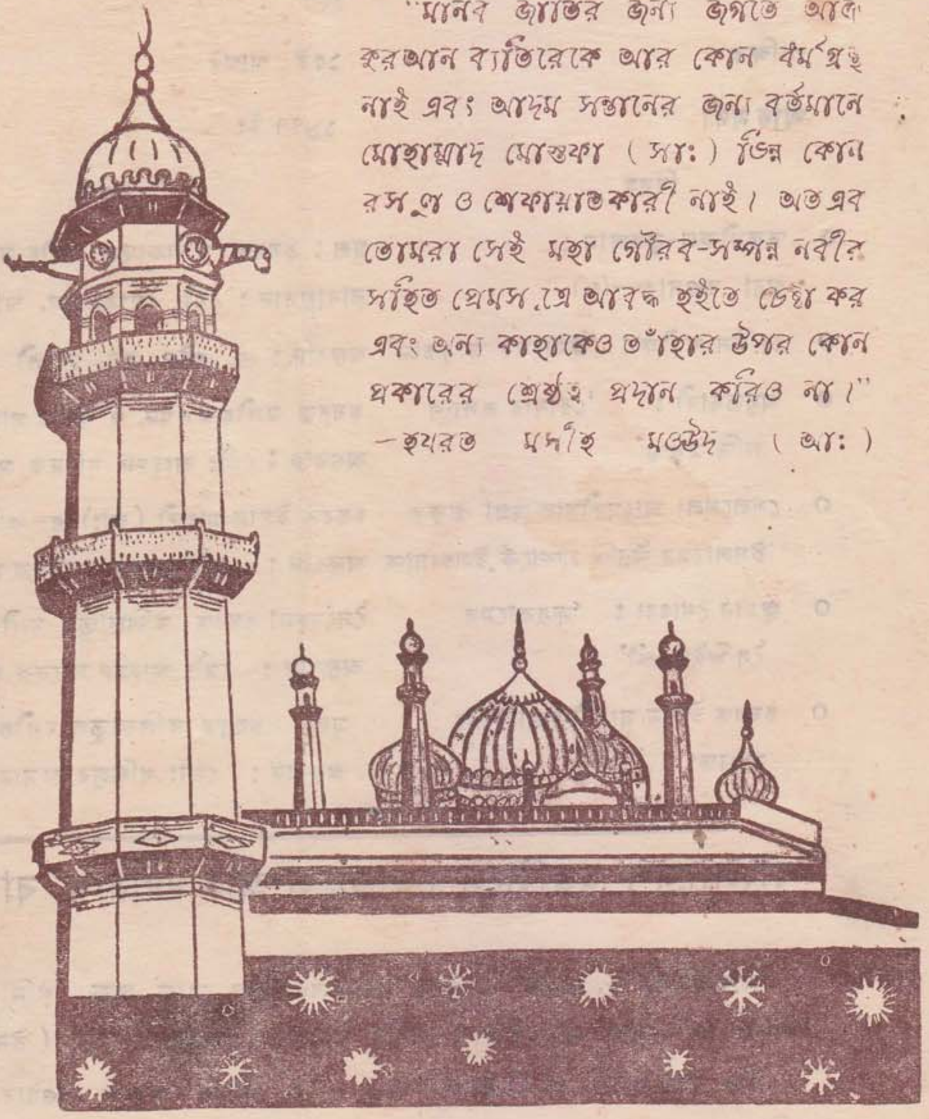

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

৩০শে শ্রাবণ ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ ইং : ২৮শে শাবান ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক	১৫ই আগষ্ট	৩১শ বর্ষ
আহ্‌মদী	১৯৭৭ ইং	৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সুরা কওসার—(৬)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
o হাদিস শরীফ : 'ঈমানের আরকান'	অনুবাদ : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার	১০
o অমৃতবাণী : 'রোযার কল্যাণ অতি মহান'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বি)	১১
o সেলসেলা আহমদীয়ার তথা প্রকৃত ইসলামের উন্নতি সম্পর্কে ইলহামাত	হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমদ, (সদর মুরুব্বি)	১৩
o জুমার খোৎবা : 'কুরআনের বৈশিষ্টাবলী'	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমদ. (সদর মুরুব্বি)	১৬
o হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	২৩

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ৭, ৮, ও ৯ই অক্টোবর ১৯৭৭ যথাক্রমে রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে (ইনশাল্লাহ)।

উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণের জন্য এখন হইতে প্রস্তুতি লওয়ার জন্য সকল স্থানীয় মজলিসের সদস্যগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। —নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিস

শুভবিবাহ

বিগত ১৭।৭।৭৭ইং তারিখে খালিসপুর, খুলনা নিবাসী জনাব আলাউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মুসাম্মত শেগুফ্‌তা আখতারের সহিত ঢাকা নিবাসী মরহুম নূর সৈয়দ সাহেবের জোষ্ঠ পুত্র এ, কে, এম, ফিরদৌসের শুভবিবাহ ২০,০০১ টাকা দেন মোহর ধার্য্যে খুলনায় সুসম্পন্ন হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি উক্ত বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন। আমিন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

৩০শে শ্রাবণ ১৩৮৪ বাং : ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ ইং : ১৫ই তবুক, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। — মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাং আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১২) হযরত মূসা (আঃ) মোটা লাঠি পাইয়াছিলেন। উহা মধ্যে মধ্যে দংশনকারী সর্প হইয়া যাইত কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কুরআনের তরবারী পান, যাহা সদা রহমতরূপে বিরাজিত। আল্লাহতায়ালা এই তরবারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, وجاهدهم به جهادا كبيرا "তুমি কুরআন করীমকে হস্তে লও এবং উহার দ্বারা জেহাদ করিয়া যাও।" (সূরা ফুরকান ৫ম রুকু)। জড় তরবারীর লড়াই মামুলি ব্যাপার এবং শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। কিন্তু কুরআন করীম এমন এক তরবারী, যাহা দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বদা কাজে লাগে এবং উহার ফলশ্রুতি রহমতের আকারে প্রকাশিত হয়। এই জন্য তাঁহাকে বার বার রহমতুল্লিল আলামিন বলা হইয়াছে। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে শাস্তি ও কঠোরতা অপেক্ষা নম্রতা ও প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ) শিক্ষা দেন যে, কেহ চপেটাঘাত করিলে, তাহাকে চপেটাঘাত কর, কেহ যদি তোমার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে, তাহা হইলে, তুমিও তাহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেল এবং যদি কেহ তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে তুমিও তাহার দাঁত ভাঙ্গ। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হইল যে, তুমি যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কর, অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এবং বিচার বিবেচনা করিয়া কর। যদি ক্ষমা করিলে ফল ভাল হইবে বুঝা যায়, তাহা হইলে দুশমনকে ক্ষমা করিয়া দাও, শাস্তির জন্য চাপ দিও না। বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংশোধন, প্রতিশোধ গ্রহণ নহে।

(১৩) হযরত মুসা (আঃ)-কে হাত সাদা হওয়ার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ নিদর্শন দেখাইবার কালে, তাঁহার হাত সাদা হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে سراجا منيرا "প্রোজ্জল সূর্য" (সুরা আহযাব—৬ষ্ঠ রুকু) আখ্যা দিয়াছেন। সুর্যের সারা অঙ্গ সমুজ্জল এবং সকল সময় উহা সর্বদিকে আলো দেয়। হযরত মুসা (আঃ)-এর কেবল হাত ঝলকাইত এবং তাহাও ক্ষণেকের জন্য। অথচ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সারা অস্তিত্ব ছিল সদা প্রোজ্জল। এই দুই নিদর্শনের পার্থক্যের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাই জানাইয়াছেন যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর শিক্ষা ছিল ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণপ্রভাদানকারী এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষা চির স্থায়ী, সমুজ্জল এবং অন্ধকার-বিনাশকারী।

(১৪) হযরত মুসা (আঃ)-কে কেবল বনি ইস্রাইলের জন্য নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, وما ارسلناك الا كافة للناس "সমগ্র মানবজাতিকে এক মণ্ডলিতে একত্রিত করিবার জন্য তোমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।" (সুরা সাবা—৩য় রুকু)।

উপরে বর্ণিত সকল বিষয় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।

(১৫) হযরত মুসা (আঃ)-কে এক নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যে জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের প্রথম পুত্র মারা যায়। যখন সকলকেই মরিতে হয়, তখন ইহা কোন বড় নিদর্শন নহে। ইহার মোকাবেলায় আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল, উহা দুনিয়ার ইতিহাসে নজীর বিহীন। তাঁহার দুশমনগণ তাহাদের প্রথম পুত্রই হারায় নাই, বরং তাহারা তাহাদের সকল আওলাদকে হারায়। তাহারা শেরক হইতে মরিয়া ঈমানে জীবন পায়। তাহারা সকলে ইসলাম কবুল করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর রুহানী পুত্ররূপে নব জন্ম লাভ করিয়া তাহাদিগের পিতৃপুরুষের শেরকের ঘরকে চিরতরে শূণ্য করিয়া দেয়। তাহাদের পিতৃপুরুষের সহিত বংশ পরিচয় কাটিয়া দিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত রুহানী পুত্রের সম্বন্ধ গড়িয়া স্বয়ং তাহারা তাহাদের বংশধরগণের জন্য পূর্বপুরুষ হইয়া গেল। ওলীদ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কত বড় দুশমন ছিল। সে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত এবং তাঁহাকে হত্যা করার প্ররোচনা দিত। আস বিন ওয়ায়েলও কত বড় দুশমন ছিল। সে সদা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত এবং যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাহিনী তৈয়ার করাইত। পুনঃ আবু

জেহেল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণে সারা জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ওলীদের পুত্র খালেদ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন এবং এমন ঈমান আনেন যে মুসলমানগণ তাঁহার নাম ইয়াদগার হিসাবে ব্যবহার করে। তাহারা নিজেদের ছেলেদের নাম খালেদ রাখে। এতদ্বারা তাহারা অমুসলমানগণের মনে ভীতি জাগরুক রাখিতে চাহে যে এখনও আমাদের মধ্যে খালেদ জীবিত আছে। এই খালেদ সেই ওলিদের পুত্র যে কসম খাইয়াছিল যে, সে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে (নাউযুবিল্লাহ লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে। খালেদ সেই ব্যক্তি যে ওহোদের যুদ্ধে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিল যে, মুসলমানদের পশ্চাৎভাগ অরক্ষিত এবং সুযোগ বুঝিয়া সে টিলার উপর হইতে মুসলমানগণকে আক্রমণ করে! ইহার ফলে মুসলমানগণের বিজয় সাময়িক পরাজয়ে পরিণত হইয়া গেল। এই খালেদ পরে ইসলাম কবুল করেন এবং তিনি ইসলামের জন্য এরূপ আত্মোৎসর্গকারী সাব্যস্ত হন যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাঁহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন যে, খালেদ কাঁদিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে খালেদ, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি ইসলামের সেবায় বহু বড় বড় কাজ করিয়াছ। এখন তোমার আনন্দিত হওয়ার সময় যে, শীঘ্রই তুমি বড় বড় নেয়মতরাজিতে ভূষিত হইবে।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুমি আগাইয়া এসো। আমার পৃষ্ঠদেশ হইতে কাপড় সরাইয়া দেখ।" বন্ধু যখন তাহার পিঠের কাপড় তুলিলেন, তখন খালেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পিঠের চামড়ায় কি এমন কোন স্থান খালি আছে, যেখানে ক্ষত-চিহ্ন নাই?" তিনি বলিলেন "না, কোথাও তিল পরিমাণ ক্ষত-চিহ্ন বিহীন চামড়া নাই।" তখন খালেদ বলিলেন, "আমার বুকের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দেখ।" বন্ধু যখন বুক ও পেটের উপর হইতে কাপড় সরাইলেন, তখন খালেদ কহিলেন, "আমার বুকে এবং পেটে কি এমন কোন স্থান খালি আছে, যেখানে তরবারীর আঘাত-চিহ্ন নাই?" বন্ধু উত্তর দিলেন, "না, কোন জায়গা ক্ষত-চিহ্ন বিহীন নাই।" অতঃপর খালেদ বলিলেন, "এখন আমার ডাহিন পায়ের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দেখ, উরু দেশ ও জঙ্ঘা হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত কি কোথাও ক্ষত চিহ্ন বিহীন জায়গা আছে?" বন্ধু উত্তর দিলেন, "না, নাই।" অতঃপর খালেদ বলিলেন, "এখন আমার বাম পা হইতে কাপড় সরাইয়া দেখ, উপর হইতে নীচে পর্যন্ত কোথাও কি ক্ষত-চিহ্ন বিহীন জায়গা আছে?" বন্ধু দেখিয়া বলিলেন, "কোথাও তিল-পরিমাণ অক্ষত স্থান নাই।" এই ভাবে খালেদ একের পর এক করিয়া তাঁহার সারা অঙ্গ দেখাইয়া

পুনঃরায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হে আমার দোস্ত! আমি এ জন্য কাঁদিতেছি না যে, আমি মরিতে চলিয়াছি। কুফরের অবস্থায় আমি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকাবেলা করিয়াছি। তাহার পর আল্লাহ্তায়ালা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দেন। আমি চাহিয়াছিলাম এবং চেষ্টাও করিয়াছিলাম যে যুদ্ধে শহীদ হইয়া আমি নিজের এবং আমার খান্দানের কৃত অপরাধের কাফফারা দিব। আমার আপাদ মস্তক সারা দেহে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তুমিও সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আমার সংকল্প পূর্ণ করিতে কোন ত্রুটি করি নাই। বার বার আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি কিন্তু মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করে নাই। বার বার আমাকে সে উপেক্ষা করিয়াছে। বার বার আমার শাহাদাতের বাসনা বিফল হইয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "দুর্ভাগ্য আমার! কোথায় আমি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হইয়া মরিব, না আজ খাটিয়ায় শুইয়া মরিতেছি।" ইহা কত বড় নিদর্শন, যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার জানী দুশমন তাঁহার সংস্পর্শে ইসলাম কবুল করিয়া কি বিরাট কুরবানীর নিদর্শন পেশ করে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর রুহানী শক্তি তাঁহার শক্ত হইতে শক্ত দুশমনের মধ্যে কি অপূর্ব পরিবর্তন, অদম্য সাহস ও সত্যের জন্য কুরবানীর স্পৃহা সৃষ্টি করে। দুনিয়ার ইতিহাসে অন্য কোথাও ইহার নযীর নাই।

সুতরাং দেখা গেল হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের প্রত্যেকের প্রথম পুত্র নিধন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই সকল মরণ পথের যাত্রীদের মধ্যে কেহ হযরত মুসা (আঃ)-এর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কওমের আওলাদকে আল্লাহতাআলা ঈমান ও প্রেমের অভিষেক দিয়া এমন ভাবে তাহাদের কুফরী হালতের মৃত্যু ঘটান যে, ইহলোক হইতে যখন তাহাদের সত্যই বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের মনে মহা খেদ রহিয়া গেল যে, যুদ্ধের ময়দানে লড়িতে লড়িতে শাহাদাত বরণ করিতে না পারিয়া কেন তাহাদিগকে খাটিয়ায় শুইয়া সাধারণ মরণে মরিতে হইতেছে।

আমর বিন আসী, যিনি পরবর্তীকালে আমর বিন আস নামে পরিচিত হন, তাঁহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি বড়ই ছটফট করিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র যিনি পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবা (রাঃ)-এর মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন, পিতার অস্থিরতা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এত অস্থির হইতেছেন কেন? আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে কত মর্যাদা দিয়াছেন, তিনি আপনাকে ঈমান

আনার সৌভাগ্য দিয়াছেন। আম্‌র বিন আস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পুত্র! ঈমান আনার পূর্বে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আমার এমন দুশমনী ছিল যে, আমি ঘৃণায় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতাম না। ঘটনাক্রমে যদি কখনও আমি তাঁহার সামনা সামনি পড়িয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমি চক্ষু নীচে করিয়া লইতাম, যাহাতে তাঁহার চেহারা নজরে না পড়ে। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ঈমান আনার সৌভাগ্য দিলেন তখন তিনি এত প্রিয় হইয়া পড়িলেন যে, ভালবাসার আধিক্যে আমি তাঁহার চেহারার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারি নাই। আমি সদা আমার দৃষ্টি নীচে রাখিতাম। কুফরের অবস্থাতে বিদ্বেষে আমি তাঁহার চেহারা দেখি নাই এবং ঈমানের অবস্থায় ভালবাসার আধিক্য আমি তাঁহার চেহারা দেখি নাই। ফলে যদি কেহ আমাকে হুজুর (সাঃ)-এর আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি কিছুই বলিতে পারিব না। পুত্র! আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্য আমাকে বহু নেকী করার সুযোগ দিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর অনেক ঝগড়া হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি ভুল করিয়াছি এখন আমি বড়ই ভীতি বোধ করিতেছি যে মরণের পর পরলোকে গিয়া আমি আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কিভাবে মুখ দেখাইব।" ইহা চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়, আম্‌র বিন আস এককালে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কত বড় দুশমন ছিল। দিবারাত্র তাঁহার অকল্যাণ চিন্তায় রত থাকিত। কিন্তু যখন তিনি ঈমান আনিলেন, তখন তিনি প্রেমের ছুরিতে যবেহ্‌ হইয়া গেলেন। যিনি প্রথম জীবনে কুফরের অন্ধকারাতিশয্যে এবং পরবর্তীকালে ঈমানের প্রেমালোকাতিশয্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক জীবনে কখনও দেখিলেন না, তিনি মরণ সময়ে নিজ সম্ভাব্য ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পরলোকে গিয়া কি প্রকারে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে মুখ দেখাইবেন, তাহার জন্য শরম ও ভয়ে পেরেশান।

আবার দেখুন, আবু জেহেল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কত বড় দুশমন ছিল। তাহার পুত্র ইকরামা (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিলেন। তিনি এক যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ আঃ -এর জীবন বাঁচাইবার জন্য যে কুরবানী করিয়াছিলেন, উহার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নাই। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর জীবন বাঁচাইবার জন্য নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া আন্দাজি তিন হইতে দশ লক্ষ দুশমন সৈন্যের এক বিরাট সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া উহার অন্তস্থলে অবস্থিত প্রধান সেনাপতিকে সাংঘাতিকভাবে জখম করিয়া দেন এবং সেনা দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত মুসা (আঃ)-এর দুশমন কওমের প্রত্যেকের প্রথম পুত্রের মরণ এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দুশমন কওমের আওলাদের, বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্তে প্রধান দুশমনের প্রথম পুত্রের মরণে কত প্রভেদ !

আবু সুফিয়ান তাঁহার জীবদ্দশাতেই আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রেমের শিকার হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাবিয়া (রাঃ) এক জন বড় মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। তিনি অবশ্য কতকগুলি ভুল করেন, কিন্তু তিনি ইসলামের বহু শানদার খেদমত করেন।

দেখার বিষয় এই যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের প্রত্যেকের প্রথম পুত্র মারা যায়। কিন্তু তাহাদের মরণে হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান বা প্রেমের কোন প্রকাশ ঘটে নাই। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দুশমন কওমের কুফরের সকল আওলাদ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তাহারা ঈমান ও প্রেমের সিঞ্চনে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রুহানী আওলাদে শামিল হইয়া ইতিহাসে অমর হইয়া যান।

(১৬) হযরত মুসা (আঃ)-কে দুর্ভিক্ষের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার দুশমনগণের উপর কেবল এক বৎসরের দুর্ভিক্ষ আসে। দলে দলে পঙ্গপাল আসিয়া তাহাদের ফসল খাইয়া ফেলে। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কওম সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রপীড়িত হয়। পরিশেষে তাহারা আযাব টলিবার জন্য তাঁহার নিকট দোওয়ার অনুরোধ করে। তিনি দোওয়া করেন এবং আযাব টলিয়া যায়।

(১৭) হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বতের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কুরআন ও বাইবেল দ্বারা ইহা সাব্যস্ত যে, তিনি সেই প্রকাশের তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া বেহুঁশ হইয়া যান। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাম সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভের ব্যাকুল ইচ্ছা জাগিল এবং তিনি তাঁহার দর্শনের জন্য রুহানী অভিসারে উর্ধ যাত্রা আরম্ভ করিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রতি প্রেমে উদ্বেল হইয়া সাক্ষাৎকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্বয়ং তাঁহার দিকে নামিয়া আসিলেন। অতঃপর কেবল উভয় সাক্ষাৎ করিয়াই সারিলেন না, বরং فکان قاب قوسین او ادنی অতঃপর তাঁহারা পরস্পর দুই মিলিত ধনুকের ন্যায় একত্রিত হইলেন, বরং উহারও চেয়ে নিকটতর হইলেন" আরব দেশে প্রথা ছিল, দুই ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও প্রেম হইলে দুই ধনুককে একত্রিত করিয়া মিলিত জ্যাতে টংকার দিয়া তীর ছুড়ত। ইহার অর্থ এই হইত যে, যেদিকে তোমার তীর যাইবে, সেই দিকে আমার তীরও যাইবে, এবং যে দিকে আমার তীর যাইবে, সেই দিকে তোমার তীরও যাইবে

আঁ-হযরত (সাঃ) যে আল্লাহতায়ালাকে দেখিলেন তাহাই নহে, বরং আল্লাহতায়ালা তাঁহার সহিত চুক্তি আবদ্ধ হইলেন যে, যেদিকে তোমার তীর যাইবে, সেদিকে আমার তীরও যাইবে। আমরা দেখিতে পাই, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর তীর সদা সেই দিকে যাইত, যে দিকে আল্লাহতায়ালার তীর ছুটিত, তাহাতে লক্ষ্যস্থল একান্ত নিকট আত্মীয় হউক না কেন। অপর দিকে আমরা দেখি যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহতায়ালার এরূপ প্রেম ছিল যে, তিনিও সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিতেন, যেই দিকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তীর চালাইতেন। ফলতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, বদরের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দুশমনের প্রতি যে এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, উহার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন, وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى "যখন তুমি দুশমনগণের প্রতি কঙ্কর মুষ্টি নিক্ষেপ কর, তখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ কর নাই, বরং আমি নিক্ষেপ করি। কারণ তোমার সহিত চুক্তি ছিল যে, যেদিকে তোমার তীর চলিবে, সেদিকে আমার তীরও চলিবে।" (সুরা আনফাল ২য় রুকু)। আল্লাহতায়ালার এই সহযোগীতা-মুলক ব্যবহার ছিল দুশমনের মোকাবেলায়। এখন তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি ব্যবহারের কথা শুনুন। فوق ايديهم "বয়াতকারীগণ ও তোমার গোলামীতে যাহারা দাখিল হয়, তাহাদের হস্তের উপর আমার হস্ত স্থাপিত, কারণ তাহারা তাহাদের হস্ত তোমার হস্তে সমর্পন করিয়া দিয়াছে।" উভয় দৃষ্টান্তেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হস্তকে আল্লাহতায়ালা নিজ হস্ত বলিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহতায়ালা এবং আঁ হযরত (সাঃ) উভয়ে যেন এক হইয়া গেলেন। এমন ভাবে তাঁহারা মিলিত হইলেন যে, যখন তীর চলিত, তখন উভয়ের তীর একই দিকে চলিত। কাহারও ভাগ্যে শুভদৃষ্টি পতিত হইলে, উভয়েরই শুভদৃষ্টি একত্রে নিপতিত হইত।

(১৮) হযরত মুসা (আঃ) কেবল কেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে শুধু কেতাব নহে, বরং কালামুল্লাহ দেওয়া হয়। এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বহু। কেতাবের অর্থ হুকুম, যাহার শব্দ পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু কালামুল্লাহর মধ্যে শব্দ পরিবর্তন সম্ভব নহে। কেতাবুল্লাহর মধ্যে শব্দ নিচয়ের সংরক্ষণের শর্ত নাই। কিন্তু কালামুল্লাহর মধ্যে শব্দ নিচয়ের সংরক্ষণের শর্ত রহিয়াছে।

পুরাকালে আরবের বাদশাহগণের মধ্যে রেওয়াজ ছিল যে, তাঁহারা নিজেদের দরবারে বড় বড় সাহিত্যিককে উজীর রাখিতেন। এক বাদশাহের এক উজীর ছিলেন, যিনি "র" উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। অনেক শিশু যেমন "র"-কে "ল" বলে, তেমনি সেই উজীরের অবস্থা ছিল। একদা এক ব্যক্তি সেই বাদশাহের নিকট অভিযোগ করিল,

"আপনি এমন এক ব্যক্তিকে উজীর রাখিয়াছেন, যিনি "র" উচ্চারণ করিতে পারেন না। তিনি "র"-কে "ল" বলেন। যদি কোন বাদশাহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আপনার উজীরের এই দোষ ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে আপনার সম্মান হানি হইবে।" বাদশাহ বলিলেন "উজীর তো আমার নিকট বহু দিন আছেন। কোন দিন আমি তাঁহার মধ্যে এই ত্রুটি লক্ষ্য করি নাই। নিশ্চয় তাঁহার মধ্যে এই ত্রুটি থাকিলে কোন না কোন দিন ধরা পড়িত।" সেই অভিযোগকারী বলিল, "আপনি "র" অক্ষর সম্বলিত কোন এক আদেশনামা লিখিয়া তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন, তাহা হইলে সত্য প্রকাশ পাইবে। সে যুগে নিয়ম ছিল বাদশাহ যখন কোন আদেশ জারি করিতেন, তখন তিনি বলিয়া যাইতেন এবং উজীর উহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাতেব বা লিখককে পুনঃরাবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া যাইতেন এবং কাতেব উহা লিখিয়া যাইত। তদনুযায়ী বাদশাহ বহু "র" অক্ষর সম্বলিত এক আদেশ বলিয়া গেলেন,

امر امير الامراء ان تحفر البئر فى الطريق ليشرب منه الماء الصادر
و الوارد-

"আমারা আমিরুল অমারা আন তুহবারাল বে'রা ফিত্‌তারীকে লে ইয়াশ্‌রেবা মিনহুল মা' আস্‌ সাদেরো ওয়াল ওয়ারেদো" অর্থাৎ "বাদশাহ আদেশ দিতেছেন যে অমুক রাস্তায় একটি কূঁয়া খুদিয়া দেওয়া হউক, যেন শহরে আগমনকারী ও শহর হইতে ফেরৎগামী সকল পথিক উহার পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিতে পারে।" উজীর এই আদেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গে কাতেবকে লিখিতে বলিলেন,

حكم حاكم الحكام ان يقلب القليب فى السبيل ليستفع منه العادى و البادى

এই আদেশের মধ্যে অত্যন্ত নিপুনতার সহিত বাদশাহের "র" অক্ষর সম্বলিত শব্দগুলির নিখুত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উজীরের অদ্ভূত ভাষাজ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বাদশাহ বিস্মিত হইলেন। অভিযোগকারী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "দেখিলেন, উজীর "র" অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না।" বাদশাহ বলিলেন, "আমি তাঁহার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিলাম না। বরং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাইলাম। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, তিনি কত শীঘ্র আমার আদেশের অর্থকে অক্ষুন্ন রাখিয়া উহার শব্দগুলিকে নিপুণভাবে বদলাইয়া দিয়াছেন। এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে আমি ছাড়িতে পারি না।"

শ্রোতা এইভাবে কোন বাক্যের মধ্যে শব্দ বদল করিতে পারে এবং শব্দ চয়নে ভুলও করিতে পারে। যেমন আমরা বলিয়া থাকি যে, অমুক হাদীসটি মূল শব্দে সংরক্ষিত

আছে এবং অমুক হাদীসটি মর্মগত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত হাদীসগুলিতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নিজস্ব ব্যবহৃত শব্দগুলি অপরিবর্তীত অবস্থায় থাকায়, যে দেশ বা যাহার নিকট হইতে ওগুলি পাওয়া যাউক, উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না এবং এই জন্য ঐগুলি সন্দেহাতীত ও পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মর্মগত হাদীসগুলি বর্ণনাকারীর নিজ ভাষায় ব্যক্ত হওয়ায় ওগুলি সন্দেহাতীত ও পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। ছোট ছোট বা ছন্দযুক্ত হাদীসগুলি সাধারণতঃ স্মরণে থাকে, সেই জন্য ওগুলি অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। যেমন একটি ছন্দযুক্ত হাদীস আছে.

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن -
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -

অর্থাৎ" এমন দুইটি বাক্য আছে, যাহা পাঠ করা সহজ, কিন্তু বিচার দিবসে নেকীর পাল্লায় খুব বেশী ভারি হইবে এবং রহমান খোদার নিকট কথা দুইটি বড়ই প্রিয়। সেই কথা দুইটি হইল "সুবাহানল্লাহে ও বেহামদেহী সুবাহানল্লাহেল আযীম।" এই হাদীসের ছন্দ এত সুন্দর যে, ইহা সহজে মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং ভুল হয় না।

আমরা দেখিতে পাই, হযরত মুসা (আঃ)-এর কেতাবে, আল্লাহতায়ালার কতকগুলি হুকুম শব্দগত ভাবে রহিয়াছে এবং ককগুলি হযরত মুসা (আঃ)-এর নিজ ভাষায় রহিয়াছে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট যে কেতাব নাযিল হয়, উহার ভাষা আগাগোড়া আল্লাহতায়ালার নিজস্ব। সুরা ফাতেহার বিসমিল্লাহ্‌র "বে" অক্ষর হইতে সুরা নাসের শেষ অক্ষর "সিন" পর্যন্ত সকলই আল্লাহতায়ালার। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র রদবদল বা কাট-ছাঁট হয় নাই। ইহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কত বড় ফযিলত। কোন ইহুদি বা খৃষ্টান খোদার কসম খাইয়া বলিতে পারে না যে, বর্তমান তওরাত সেই কেতাব, যাহা হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর নাযেল হইয়াছিল এবং যদি তাহাদের কথা সত্য না হয়, তাহা হইলে যেন তাহাদের ও তাহাদের পরিবার পরিজনের উপর আল্লাহতায়ালার অভিশাপ নাযেল হয়। কিন্তু আমারা নিঃসংকোচে কুরআন মজিদ সম্পর্কে এই কসম খাইতে পারি যে, ইহার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র রদবদল হইয়া থাকে বা ভবিষ্যতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ও আমাদের পরিবারপরিজনের উপর আল্লাহতায়ালার লা'নত নাযেল হউক এবং পরকালেও আল্লাহর লা'নত নাযেল হউক। হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কত বড় ফযিলত। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঈমান এবং উহার আরকান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)

১০৮। হযরত উমর বিন্ খাত্তাব রাযি আল্লাহু আনহু বলেন :

"আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুজুরে বসিয়া ছিলাম তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার কাপড় খুব সাদা ছিল। চুল ছিল কালো। সে মুসাফেরও ছিল না এবং কেহ তাহাকে চিনিত না। সে আসিয়া আঁ-হযরতের হাঁটুর সঙ্গে তাহার হাঁটু মিলাইয়া আদবের সাথে বসিল। অতঃপর বলিতে আরম্ভ করিল : "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ! ঈমান কি ?' তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহুর উপর, তাঁহার ফেরেস্তাগণের উপর, তাঁহার কেতাব সমূহের উপর, তাঁহার রসুলগণের উপর বিশ্বাস রাখ। পরকালে এবং ভাল ও মন্দ তক্দীরে বিশ্বাস রাখ।" (তিরমিযি)

১০৮। হযরত আবু যার. (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : ঈমানের সত্তর বা যাটের কিছু উর্ধে শাখা আছে। তন্মধ্যে সকলের উপরে হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এবং সর্ব নিম্ন হইল পথ হইতে কষ্ট দায়ক জিনিষ, অপসারণ করা এবং লজ্জাও ঈমানের একটি অংশ।

(বুখারী)

১১০। হযরত নু'মান বিন্ বশীর (রাযিঃ) বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"মুসলমানগণের দৃষ্টান্ত, তাহারপারস্পরিক প্রেম, দয়া ও সৌজন্যে দেহবৎ, যাহার কোন অংশ পীড়িত হইলে ঐ কারণে সমগ্র দেহ চেতনা অস্থির ও তাপযুক্ত হয়। (মুসলিম)।

১১১। হযরত আবু মুসা আশ্য়ারী (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "এক মুমেন অন্য মু'মেনের জন্য মজবুত ইমারতের ন্যায়, যাহার একাংশ অন্য অংশকে শক্তি দেয় এবং সুদৃঢ় করে।" তিনি ইহা বুঝানোর জন্য তাঁহার আংগুলগুলির ফাঁক তৈরী করিলেন যে, এই প্রকারে এই প্রাসাদের সকল অংশ পরস্পর মজবুত হয়। (বুখারী)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিক অনুবাদ) :— এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

'রোজার কল্যাণ অতি মহান'

"কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র আয়াতাংশ হইতেই রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়: شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن :

(অর্থাৎ—রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।—অনুবাদক)

সুফিগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশফ' (দিব্য দর্শন) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফ্‌স" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোজায় "তাজল্লিয়ে-কল্‌ব" (আত্মায় উজ্জলতা) সাধিত হয়। "তাজকিয়া-নফ্‌স" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ—রিপু দমনের শক্তি বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশফ" বা দিব্য দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা। সুতরাং

شهر رمضان الذى انزل فيه القران

(অর্থাৎ, রমযান মাসেই কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত বহন করে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার কল্যাণ অতি মহান। কিন্তু অসুখ বিসুখ ও রোগ ব্যাধি মানুষকে এই নে'মত ও কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে, যৌবনকালে আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, রোজা রাখা 'আহ্‌লে-বাইত' (রসুলুল্লাহ্‌ সাঃ এর পবিত্র পরিবার)-এর সুন্নত। আমার (ইমাম মাহ্‌দী) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :

سلمان منا اهل البيت

(সালমান আমাদের তথা আহ্‌লে বয়েতের শামিল)

'সালমান'-এর অর্থ صلح (সন্ধি বা শান্তি স্থাপন)—অর্থাৎ এই ব্যক্তির হস্তে দুইটি সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইবে—এক, আভ্যন্তরীণ (ইসলামের ভিতরে বিভেদ নিষ্পত্তি) দ্বিতীয়, ইসলামের বাহিরে (অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সংঘাত নিরাময়) এবং সে তাহার কাজ নম্রতার সহিত করিবে, তরবারির দ্বারা নয়। (আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে,) আমি হযরত হুসাইন (আঃ)-এর স্বভাব ও ধারায় আদিষ্ট নই বরং হযরত হাসান (আঃ) এর স্বভাব ও ধারায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি যুদ্ধ পরিহার করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে,

রোজার দিকে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। সুতরাং আমি তখন ছয় মাস ব্যাপী রোজা রাখিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, বিভিন্ন জ্যোতির স্তম্ভ সমূহ আকাশের দিকে উঠিতেছে। ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না যে, সেই সকল আলোক-স্তম্ভ জমীন হইতে আকাশে যাইতেছিল, না আমার 'কল্‌ব' (অন্তঃকরণ) হইতে। কিন্তু এ সব সাধনা যৌবন কালেই সম্ভবপর ছিল। যদি আমি তখন চাইতাম, ক্রমাগত চারি বৎসর রোজা রাখিতে পারিতাম। ... ...খোদাতাযালার আহ্‌কাম দুই ভাগে বিভক্ত। এক, মালী (আর্থিক) ইবাদত। দ্বিতীয়তঃ, কায়িক ইবাদত। মালী ইবাদত তো সে ব্যক্তির পক্ষেই পালন করা সম্ভব হয়, যাহার নিকট মাল আছে এবং যাহার কাছে মাল নাই, সে অপারগ ও ক্ষমার্হ, এবং দৈহিক ইবাদতও মানুষ যৌবন কালেই পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হয়। নতুবা, ষাট বৎসর যখন পার হইয়া যায়, যখন বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যেমন চোখ দিয়া পানি ঝড়া ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। ইহা ঠিক কথা যে, বার্ধক্য শত রোগের বাসা। মানুষ যৌবন কালেই যাহা (সাধনা) করিয়া লয়, তাহারই বরকত ও কল্যাণ সে বৃদ্ধকালেও প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি যৌবন কালে কিছুই করে না, তাহাকে বৃদ্ধকালেও শত ধরণের দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। কবির কথায়, 'শুভ্রকেশ মৃত্যুর সংবাদ বাহক।'

মানুষের কর্তব্য ইহাই, সে যেন যথাসাধ্য খোদাতাযালার নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করে। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, ان تصوموا خير لكم অর্থাৎ, যদি তোমরা রোজা রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণ জনক।"

(আল-বদর, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৭ম, পৃঃ ৫২, তাং ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নহে, বরং ইহার একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তাহার আত্মশুদ্ধি এবং 'কাশফী-তাকত' বা দিব্য-দর্শন শক্তি সমূহ বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করিয়া অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারকে সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। খোদাতায়ালার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিৎ যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যাহা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে, এবং আচার অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তাহার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র হাম্‌দ প্রশংসা), তস্‌বীহ্‌ (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং তাহ্‌লীলের (আল্লাহ্‌র তৌহিদ ঘোষণার) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাহাতে তাহার দ্বিতীয় খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।" (আল-হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭)

সেলসেলা আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের উন্নতি সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)—এর কতিপয় ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

"হে আহমদ। খোদাতায়ালা তোমাতে বরকত দান করিয়াছেন। যাহা কিছু তুমি চালাইয়াছ তাহা তুমি চালাও নাই, বরং খোদাতায়ালা চালাইয়াছেন" (তাযকেরা পৃঃ ৪৩)

"প্রত্যেক বরকত ও কল্যাণ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযা সাল্লামের তরফ হইতে আসিয়াছে।" (তাযকেরা, পৃঃ ৪৫)

"হে আমার রব! তুমি আমাকে একা ছাড়িও না। তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। হে আমার রব! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইস্‌লাহ (সংস্কার) সাধিত কর। হে আমার রব! আমাদের এবং আমাদের কওমের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমি উত্তম মীমাংসা কারী" "এবং তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তোমরা তোমাদের পন্থায় সফলতালাভের উদ্দেশ্যে কার্যরত থাক, আমিও কর্মতৎপর আছি। তারপর দেখিবে, কাহার কর্মতৎপরতায় কবুলিয়ত ও সফলতা লাভ হয়।" (তাযকেরা, পৃঃ ৪৭, মার্চ ১৯৮২)

"তুমি খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। সাবধান! খোদার রহমত সন্নিকট, সাবধান! সাহায্য তোমার সন্নিকট। সেই সাহায্য প্রত্যেক দূরের পথ দিয়া (অর্থাৎ দূর-দূরান্ত হইতে) তোমার নিকট পৌঁছিবে এবং এরূপ পথ দিয়াও, যাহা মানুষের অত্যাধিক চলাচলে গর্ত হইয়া যাইবে। খোদাতায়ালা নিজ হইতে তোমার সহায্য করিবেন। তোমার সাহায্য সেই সকল লোক করিবে যাহাদের অন্তরে আমরা ওহী নাযেল করিব।"

(তাযকেরা পৃঃ ৬২, ১৮৮২ ইং)

"আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উত্তোলন করিব (অর্থাৎ সম্মান ও উন্নতি দান করিব) এবং তোমার অনুসারীদিগকে তোমার অস্বীকারীদিগের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল ও জয়যুক্ত করিয়া রাখিব।"

(তাযকেরা, পৃঃ ৬২, ১৮৮২ইং)

"তুমি আনন্দভরে চল, কেননা তোমার বিজয়কাল সন্নিকট, এবং মোহাম্মদীয়গণের পদ উচ্চ মিনারায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।" (তাযকেরা, পৃঃ ১০২ ইং)

"আমি আমার জ্যোতির্বিকাশ দেখাইব। আমার শক্তি ও মহিমার বিকাশ দ্বারা তোমাকে উঠাইব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিলেন, কিন্তু পৃথিবীবাসী তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, পরন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং পরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা সুপ্রকাশিত করিবেন।" (তাযকেরা পৃঃ ১০৮)

"খোদা তোমার নামকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া আবধি সম্মানের সহিত কায়েম রাখিবেন এবং তোমার দওয়াতকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পেঁছাইবেন। আমি তোমাকে উঠাইব এবং নিজের দিকে ডাকিব। তোমার নাম ভূ-পৃষ্ঠ হইতে কখনও উঠিবে না। এরূপ হইবে যে, যে সকল লোক তোমার লাঞ্ছনা কামনায় নিমগ্ন ও তোমাকে অকৃতকার্য করার জন্য তৎপর এবং তোমাকে ধ্বংস করার চিন্তায় নিয়োজিত, তাহারা সকলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং ব্যর্থতা ও বিফলতার মধ্যেই তাহারা মৃত্যু বরণ করিবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম করিবেন এবং তোমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন ... ...।" (তাযকেরা, পৃঃ ১৪৫—১৪৬, সন ১৮৮৬ ইং)

"তুমি পরাভূত, তথা দৃশ্যতঃ পরাজিতের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হওয়ার পর, বিজয়ী হইবে এবং শুভ পরিণাম তোমারই জন্য নির্ধারিত। এবং তোমার উপর হইতে আমরা সকল বোঝা নামাইয়া দিব যাহা তোমার কমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ...." (তাযকেরা পৃঃ ১৯০—১৯১)

"আমি ফাত্তাহ্ (সর্ববিজয়ী ও বাধাবিপত্তি অপসারণকারী)। আমি তোমাকে বিজয় দান করিব। বিস্ময়কর সাহায্য তুমি প্রত্যক্ষ করিবে। এবং অস্বীকাকারীগণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যকার যাহাদের ভাগ্যে হেদায়েত লাভ করা নির্ধারিত আছে, তাহারা তাহাদের সিজদাস্থান গুলিতে এই বলিয়া মাথা নামাইবে যে, হে আমাদের রব, আমাদের গোনাহ ক্ষমা কর, আমরা অপরাধী।" (তাযকেরা পৃঃ ২০২, সন ১৮৯২ ইং)

"খোদাতায়ালা দুইটি মুসলমান দলের মধ্যে একটির পক্ষে হইবেন। সুতরাং ইহা বিভেদেরই ফল। আমি সৈন্যবাহিনী সহকারে তোমার সাহায্যার্থে আকস্মীকভাবে আসিব।" (তাযকেরা, ৭১১, সন ১৯০৭ ইং)

"জবরদস্ত শ্রেণী নিদর্শনাবলীর দ্বারা উন্নতি সাধিত) হইবে।" (তাযকেরা, পৃঃ ৭৫২, সন ১৯০০ ইং)

"প্রস্থানকাল আসিয়াছে, হাঁ প্রস্থানকাল আসিয়াছে। আল্লাহতায়ালা সমস্ত বোঝা নিজেই তুলিয়া লইবেন।" (তাযকেরা পৃঃ ৭৫২ সন ১৮৮৬ ইং)

"ভয় করিও না, হে মুমিনগণ!" (তাযকেরা, পৃঃ ৭৫২, সন ১৯০৮ইং)

"আল্লাহতায়ালা কি অপন বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?!" (তাযকেরা, পৃঃ)

"আমাকে এ নিশ্চৎ সুসংবাদ দান করা হইয়াছে যে, যদি ধর্মের কোন বিরুদ্ধাচরী আমার সম্মুখে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার উপরে জয়-যুক্ত হইব এবং সে লাঞ্ছিত হইবে।" (তাযকেরা, পৃঃ ২১৬, সন ১৮৭২ ইং)

"আমি তোমাকে বরকত ও অশিস দান করিব এবং উহার জ্যোতিসমূহ উদ্ভাষিত করিব, এমনকি বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ তোমার বস্ত্র হইতে বরকত ও আশিস অন্বেষণ করিবে। আমি সেই ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিব, যে তোমার অবমাননা করিবে।" (তাযকেরা, পৃঃ ২৪০, সন ১৮৯৩ ইং)

"আমি সন্যবাহিনী সহ আকস্মিকভাবে তোমার সাহায্যার্থে আসিব।" (তাযকেরা, পৃঃ ১৯৬, সন ১৮৯৬ ইং)

"আমি (দিবা দর্শনে) দেখিলাম, রাশিয়ার জারের যষ্ঠি আমার হাতে আসিয়া গিয়াছে। উহা সুদীর্ঘ এবং সুন্দর। অতঃপর, আমি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করায়, দেখিলাম, উহা একটি বন্দুক, বরং উহার ভিতরে গোপন সুড়ঙ্গ সমূহ রহিয়াছে, যেন উহা বাহ্যতঃ লাঠী বলিয়া মনে হয় এবং উহা বন্দুকও বটে। তারপর দেখিলাম, খওয়ারজম শাহ্, যিনি বুআলী সায়নার সম-সাময়িক ছিলেন, তাঁহার তীর ধনুক আমার হাতে রহিয়াছে। বুআলী সায়নাও আমার পার্শে দাঁড়াইয়া আছেন এবং সেই তীর ধনুকের দ্বারা আমি একটি বাঘ শিকার করিয়াছি।" (তাযকেরা, পৃঃ ৪৮৫ সন ১৯০৩ ইং)

"আমি আমার জামাতকে রুশ এলাকায় বালুকারাশীর ন্যায় দেখিতে পাইলাম।" (তাযকেরা, পৃঃ ৮১০)

"আমি তোমার সঙ্গে আছি, হে রসূলুল্লাহর (মহা আধ্যাত্মিক) পুত্র!" "ভূ-পৃষ্ঠের সকল মুসলমানকে একত্রিত কর, একই ধর্ম (ইসলাম)-এর উপরে।" (তাযকেরা, পৃঃ ৫৭১, সন ১৯০৫ ইং)

"এই সকল নিদর্শন তোমার জন্য পৃথিবীতে প্রদর্শিত হইবে, যাহাতে পৃথিবীর মানুষ তোমাকে চিনিতে পারে।" (তাযকেরা, পৃঃ ৬০৮, সন ১৯০৬ ইং) (ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(তারিখ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ইং, স্থান : মসজিদে মোবারক, রাবওয়া)

'ফুরকান' হওয়া কুরআন করীমের অন্যতম কল্যাণ। রমযান শরীফে সেই কল্যাণে আমরা বহুলাংশে ভূষিত হইতে পারি।

'ফুরকানের' অর্থ এরূপ পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ হেদায়েত (পথনির্দেশ), যাহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্টাকারে পার্থক্য নিরূপন করে।

'লাইলাতুল কদর' এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের অবসান, যখন তাহার বৎসর ব্যাপী সাধনা ও আমল অনুযায়ী তাহার তকদীরের ফয়সালা করা হয়।

যে ব্যক্তি শৈথিল্য ও গাফলতির মধ্য দিয়া সারা বৎসর অতিবাহিত করে, লাইলাতুল কদরের ফয়সালা তাহার পক্ষে আনন্দদায়ক হইতে পারে না।

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর আকদাস (আঃ) নিম্নরূপ আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর বলেন :

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
هدی للناس و بینات من الهدی
والفرقان - (البقرة ایت ١٨٦)

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, রমযান মাসের সহিত কুরআন করীমের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে, এবং 'ফুরকান' হওয়া কুরআন করীমের মৌলিক কল্যাণ সমূহের অন্যতম কল্যাণ— তোমরা চাহিলে এবং মুজাহেদা ও সাধনা করিলে, রমযান মাসে সেই কল্যাণ হইতে অধিকতর অংশ লাভ করিতে পার। ফুরকানের অর্থ, এরূপ বস্তু যাহা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে। কুরআন করীম সম্বন্ধে ফুরকান শব্দ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয় যে, ইহা এমন এক পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন হেদায়েত বা নির্দেশনামা, যাহা প্রত্যেক ভ্রান্ত আকিদা (ভাব-ধারণা ও বিশ্বাস)-কে যেমন চিহ্নিত করিতেছে, তেমনি প্রত্যেক সঠিক ও সহি আকিদার সন্ধান দান করিতেছে এবং আকিদার ক্ষেত্রে উহা যেমন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করিয়া দেখাইতেছে, তেমনি ইহা এমন এক কামেল শরিয়ত (ধর্ম-বিধান) যাহা মানব জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে

অতি প্রাঞ্জলভাবে পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। প্রত্যেক বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্যকে সত্য হিসাবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা রূপে ধারাইয়া দেয় তেমনিভাবে আমল ও কর্মের ক্ষেত্রেও কুরআনের শিক্ষা বলিয়া দেয় যে. কোন্ প্রকারের আমল আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয়. সঠিক, সরল ও প্রশংসনীয়, এবং কোন্ কোন্ ও কি কি প্রকারের আমল বা কর্ম খোদাতায়ালার বিচার ও দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। যেহেতু ইহা কামেল ও সর্বাঙ্গীন হেদায়েত. সেই জন্য এই কিতাব বিপুল প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার আঁধার

এই কিতাবের পূর্বেও শরিয়ত সমূহ নাযেল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু আপেক্ষিকভাবে কুরআন করীমের মোকাবিলায় সেগুলি অপূর্ণ ছিল। যখন মানুষ তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ধারায় চরম ধাপে উত্তীর্ণ হইল এবং মানবকুল স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতায় কামেল ও সর্বাঙ্গীন শরিয়ত বহনে যোগ্য হইয়া উঠিল. তখনই কুরআন করীম নাযেল হইল, এবং উহা আসিয়া প্রত্যেক প্রকারের সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, ভ্রান্ত ও সঠিক. সত্য ও মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও ক্রিয়া-কর্ম, আমলে সালেহ এবং অসমীচীন আমলের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সুস্পষ্ট পার্থক্য ও প্রভেদ নিরূপন করিয়া দেখাইল। পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমুহ যদিও নিজ নিজ যুগের চাহিদা অনুপাতে পূর্ণ ও পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটিও এরূপ ছিল না, যাহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক প্রকারের পার্থক্য ও প্রভেদ নির্ণয় করে। সেইজন্য আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে আমাদের সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন :

ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
(سورة انفال : ٢٨)

অর্থাৎ—যদি তোমরা নিজেদের পথনির্দেশ হিসাবে অনুসরণের জন্য কুরআন করীমকে বাছিয়া লও এবং উহার অনুশাসন গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাদিগকেও এক পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করা হইবে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার শক্তি ও তওফীক দান করিবেন। কুরআন করীমের রুহানী বারাকাত ও কল্যাণরাজীর বদৌলতে তোমাদিগকে এক নূর ও জ্যোতি দান করা হইবে. যাহা তোমাদের জীবনে আসলকে নকল হইতে, শুদ্ধকে অশুদ্ধ হইতে, অন্ধকারকে আলো হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবে এবং তোমাদের পথকে সোজা ও সরল করিবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এই 'রুহানী তাসীর'—কুরআনের এই আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে অনেক কিছু লিখিয়াছেন ও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি বাছিয়া লইয়াছি। তিনি (আঃ) বলেন :

"অতঃপর কুরআন শরীফের চতুর্থ মো'জেযা হইল উহার সেই সকল রুহানী তা'সীর বা প্রভাব, যাহা সদা উহাতে সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ, তাহা এই যে, কুরআনের প্রত্যেক

অনুসারী খোদাঈ কবুলিয়তের উচ্চ মর্যাদা সমূহে উপনীত হয় এবং ঐশীবাক্যালাপে (ওহী-এলহামের সৌভাগ্যে) ভূষিত হয়। খোদা-তায়ালা তাহার দোওয়া শোনেন এবং তাহাকে প্রীতি ও ভালবাসার সহিত উত্তর দান করিয়া থাকেন। বহুবিধ গায়েবের সংবাদ ও রহস্যাবলীর সম্বন্ধে নবীদের ন্যায় অবগত করান এবং সাহায্য ও সমর্থন সুলভ নিদর্শনাবলী দ্বারা অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীব হইতে তাহাকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেন। (অর্থাৎ তাহার জন্য 'ফুরকান' সৃষ্টি করেন।) ইহাও এরূপ এক মোজেযা ও নিদর্শন যাহা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদীতে কায়েম থাকিবে।" ("একজন খৃষ্টানের তিনটি প্রশ্ন ও উহাদের জবাব," পৃঃ ২২)

মোট কথা, আল্লাহ্তায়ালা এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, কুরআন করীমের মধ্যে অসংখ্য ও বিরাট রুহানী তাসীর বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তোমরা যেন তোমাদের জীবনকে কুরআনের হেদায়েত ও নির্দেশাবলীর ছাঁচে গড়িয়া তোল এবং উহার নির্দেশিত আহ্কাম অনুযায়ী জীবন যাপন কর। ইহার ফলে এক দিকে তো তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে জ্যোতি ও দীপ্তির সৃষ্টি হইবে এবং অন্য দিকে যতটুকু তকওয়া হাসিল করিবে, তোমরা ততটুকু ঐশী নৈকট্য লাভ করিবে। সেই অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যাবলী তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করিবেন এবং তোমাদিগকে আপন সান্নিধ্য দান করিবেন। এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিবেন। এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা একজন প্রকৃত মুসলমানের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র ও স্তরের সহিত সম্পর্ক রাখে। তাহার প্রত্যেকটি কাজে, কর্মে, উঠা বসায়, চলাফেরায় এক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ্-তায়ালা মানবজীবনের প্রত্যেকটি অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, আপনি নামাযের জন্য যাইতেছেন জামাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এবং আপনি মনে করিলেন, প্রথম রাকাত পান কি না, সেই জন্য আপনি দৌড়াইতে চাহিলেন। এমতাবস্থায় ইসলাম আপনার কানে এই আওয়াজ পৌঁছায়,

الوقار، الوقار

'তুমি তোমার শালিনতা ও গাম্ভির্য রক্ষার দিকে ধ্যান রাখ।' ইহা একটি ছোট উদাহরণ, যাহা আমি এখন দিলাম। অন্যথায়, প্রত্যেক নড়াচড়াই, যাহা আমরা জীবনে করি না কেন, সে সম্পর্কে আমাদিগকে হেদায়েত দান করা হইয়াছে; সে সম্পর্কে আমাদিগকে এক নূর দান করা হইয়াছে। তেমনিভাবে আমাদের কোন রকম নড়া-চড়া না করার ও এক অবস্থা আছে—কোন কোন

সময় আমাদের স্থির থাকিতে হয়। যেমন 'মুরাকাবা' ও 'মুহাসাবায়ে নাফস' (—আত্ম-সমালোচনা ও ধ্যান-মগ্ন হওয়ার অবস্থা) ইহা যদিও সাধারণ অবস্থাতেও হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষ চিন্তা শূন্য হইয়া এবং প্রত্যেক প্রকারের চিন্তা ভাবনা হইতে আত্ম রক্ষা করিয়া নিভৃতে নির্জনে যাইয়া দৃশ্যতঃ কর্মহীন অবস্থায় থাকে, যদিও তাহার অভ্যন্তরে (অন্তঃকরণে) তাহার বিনয় ভাব এবং খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি ও গজবের ভয় এবং তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা লাভের ব্যগ্রতা হেতু তাহার ভাবজগতে এক ঝড় প্রবাহিত হয় কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা ইহাকে এক কর্মহীন ও স্থবির অবস্থা বলিতে পারি। তেমনিভাবে, মানুষ কথা বলে। কথা বলার সম্পর্কে ইসলাম আমাদিগকে এত অধিক ভাবে নির্দেশাবলী দান করিয়াছে যে পূর্ববর্ত্তী শরিয়ত বা ধর্মগুলি তো উহাদের সহস্রতম অংশেও উপনীত হয় নাই। তেমনিভাবে, একজন মুসলমান যখন নিরবতা অবলম্বন করে, অথবা যখন তাহাকে নিরবতা অবলম্বন করা উচিত, তখন তাহা সে বাসনা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করে না বরং সে এজন্য নিরব থাকে যে, সেই অবস্থায় নিরব থাকিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ দিয়াছেন। যেমন কুরআন করীমের দরস হইতেছে, বা নামায হইতেছে, এ সকল অবস্থায় চুপ থাকার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন। তেমনিভাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মজলিসের মধ্যে মানুষ বসিয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন কথা বলিতেছে। এরূপ অবস্থায় ইসলামের নির্দেশ এই যে, অন্যান্য সকলে তাহার কথা শুনিবে। এমনও হওয়া উচিত নয়যে, সকল মহিলা একত্রে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেয় অথবা সমস্ত পুরুষ এক সাথে কথা বলা শুরু করিয়া দেয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কেই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, একজনের কথা সকলে নিরবে শুনিবে। সব সময় কথা বলা, বে-মওকা কথা বলা, বিনা কারণে কথা বলা ইসলাম পছন্দ করে না। এমনি ধারায় এ বিষয়ে হাজার প্রকারের শর্ত ইসলাম আরোপ করিয়াছে।

তারপর, আমাদের মধ্যে ঘৃণা ও অনুরাগ দুইটি স্বভাবজ শক্তি বা মনোবৃত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুইটিকেও অন্ধকারে ঘুরপাক খাইয়া বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই বরং কুরআন করীম এক নূর পয়দা করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে কোন জিনিসের প্রতি তোমরা এই এই কারণে ও অমুক অমুক অবস্থায়, এই সীমা পর্যন্ত ঘৃণা পোষণ বা প্রদর্শন করিতে পার। তারপর ইসলাম বলিয়াছে, পাপকে তোমরা ঘৃণা করিবে কিন্তু ইহা বলে নাই যে, তোমরা পাপীকে ঘৃণা করিবে। ইহা এক সূক্ষ্ম তারতম্য ও প্রভেদ, যাহা কুরআন করীম নিরূপন করিয়াছে। তারপর, অনুরাগ ও ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের প্রতি এই নির্দেশ

যে, একমাত্র আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যেই আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সমূহ স্থাপন করিতে হইবে।

তারপর, মানুষের স্বভাবে ক্রোধ রহিয়াছে। ইহাও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কাল-পাত্র বিশেষে ইহার বহিঃপ্রকাশ জরুরী হইয়া থাকে, আবার কোন সময় ইহাকে দমন করা জরুরী হইয়া থাকে। যেভাবে ঘোড়াকে লাগাম দেওয়া হয়, তেমনিভাবে ক্রোধকেও মানুষ নিজের আয়ত্তে রাখিবে। উহার বহিঃপ্রকাশ শুধু সেই রঙে ও সেই পর্যায়েই হওয়া উচিত যেভাবে ইসলাম উহার অনুমতি দিয়াছে, এবং যেস্থলে ইসলাম উহাকে দমন করিতে বলিয়াছে সেস্থলে কুরআনী নির্দেশ—والكاظمين عن الغيظ অনুযায়ী আমাদের ক্রোধ দমনকারীতে পরিণত হওয়া উচিত। মোট কথা, আল্লাহতায়ালা এ বিষয়েও এক নূর দান করিয়াছেন, তথা ইহার জ্ঞান দান করিয়াছেন যে, কিরূপ পরিস্থিতিতে ক্রোধ প্রকাশ করিতে হইবে এবং কখন উহা প্রতিরোধ করিতে হইবে। সেই নূর হইল কুরআন করীমের হেদায়েত। উহার আধ্যাত্মিক প্রভাব মানুষকে এক সূক্ষ্ম ও পবিত্র বুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টি দান করে।

তারপর, ক্রোধের মোকাবিলায় সন্তোষ বা প্রসন্নতা আছে। ইহাও হাজার নিয়ন্ত্রণ ও শর্তাবলীর মধ্যে বেষ্টিত। মোট কথা আমাদের সার্বিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র ও স্তর সম্পর্কে ইসলাম আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দান করিয়াছে এবং মানবজীবনের প্রত্যেক অঙ্গের কতক দিক আমাদের জন্য প্রাঞ্জল ও উজ্জল করিয়াছে, আর কতক দিক অন্ধকারে ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে যেগুলিকে আমাদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে। সেগুলির দিকে যেন আমাদের দৃষ্টিই না যায় ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য যে, যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে তাহা আমাদের নজরে পড়িবে না; আমাদের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে না। ইসলামী শিক্ষায় তরবিয়ত প্রাপ্ত মনমানসিকতা ঐরূপ জিনিষের দিকে মনোযোগী হইতে পারে না, যাহা খোদা ও তাঁহার রসুলের দৃষ্টিতে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়।

তারপর, সংকল্প ও সাহসিকতার গুণ মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় দুঃসাহসী লোক পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকল হিম্মত ও সাহস পার্থিব লক্ষ্য ও স্বার্থেই নিয়োজিত ও বিলীন হইয়াছে। তাহারা অশান্তি ও হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছে। নরহত্যা ও লুটতরাজের পথসমুহ তাহারা অবলম্বন করিয়াছে। আর লা'নত ও অভিশাপের মালা গলায় লইয়া এ দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছে। মানুষ তাহাদিগকে স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া দিয়াছে। কিংবা যদি স্মরণও রাখিয়াছে, তবে অভিসম্পাত সহ স্মরণ রাখিয়াছে। ইহার মোকাবিলায় দ্বীনের

ক্ষেত্রেও দৃঢ় সংকল্প ও হিম্মতের প্রয়োজন রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার কুরব ও নৈকট্যের মোকাম সমূহ লাভ করার জন্য সংকল্প ও সাহসিকতার প্রয়োজন আছে। মানবজাতির সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খার জন্য সংকল্প ও সাহসিকতার প্রয়োজন আছে। ইসলামের হেদায়েত ও নির্দেশাবলির উপর সবুর ও দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকার জন্য সংকল্প ও সাহসিকতার প্রয়োজন আছে। মোট কথা, যে যে পরিস্থিতে একজন মুসলমানের পক্ষে দৃঢ় সংকল্প ও হিম্মতের প্রয়োজন, কুরআন করীম তাহা চিহ্নিত করিয়াছে এবং যে ভ্রান্ত ধরণের সংকল্প ও হিম্মতের ফলশ্রুতিতে ফসাদ ও অশান্তির উদ্ভব হয় তাহা হইতে কুরআন আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছে।

অতঃপর, আত্মসংযোগ ও দোওয়ার শক্তি মানুষকে দেওয়া হইয়াছে। কুরআন করীম আমাদিগকে এতদ্বিষয়েও প্রাঞ্জল রূপে হেদায়েত দান করিয়াছে। কিন্তু মানুষ সেই সকল নির্দেশ ও হেদায়েত ভুলিয়া যায়। যদি তাহাদের পছন্দনীয় কোন বিষয় যাহার জন্য তাহারা দোওয়া করে তাহা কবুল না হয়, কিংবা তাহাদের আভিপ্রেত কোন জিনিষ তাহারা লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়ে ক্ষেদ ও অভিযোগ সৃষ্টি হয়, এবং তাহারা সেই সকল অগণিত নে'মত ও কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া যায় যাহা আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে দোওয়া ও পরিশ্রম ব্যতিরেকেই দান করিয়াছেন। কুরআন করীম নির্দেশ দেয় যে, তোমরা খোদাতায়ালার শোকরগোজার বান্দা হইয়া জীবন যাপন কর। কুরআন দোওয়ার বিষয়ে কতক শর্ত আরোপ করিয়াছে। দোওয়ার কতক পদ্ধতি ও নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছে। দোওয়ার তাৎপর্য ও হেকমত সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছে। এতদ্বারা ইসলাম যেখানে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও অমূল্য সম্পদ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, সেখানে আমাদিগকে ইহাও বলিয়াছে যে, খোদাতায়ালা খোদাতায়ালাই বটে (তাঁহার শান সর্বোচ্চ); তিনি নাউযুবিল্লাহ্, তোমাদের গোলাম বা দাস নহেন। যখন তিনি তোমাদের কোন কথা মানিয়া লন, বা কবুল করেন, তখন তিনি এরূপ করিয়া তোমাদের প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ করেন। এবং যখন তিনি (তোমাদের দোওয়া কবুল না করিয়া) তাঁহার কথা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করেন, তিনি বলেন, সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সহিত বন্ধু সুলভ ব্যবহার করি। নতুবা কোথায় বান্দা আর কোথায় খোদাতায়ালার প্রীতি ও বন্ধুত্ব! তিনি তাঁহার নেক ও প্রীয় বান্দাদিগকে বলেন যে, তিনি যে তাহাদের কথা কোন কোন সময় মানেন না বা কবুল করেন না, তাহা এজন্য নয় যে, তিনি তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন বরং তাহাদিগকে স্বান্তনা দানের জন্য তিনি বলেন, দুনিয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্কেও তোমরা দেখিতে পাও যে, কখনও বন্ধু তোমাদের কথা শোনে, আবার কখনও সে নিজের কথা বন্ধুকে মানিতে বাধ্য করে।

সুতরাং যখনই আমি আমার কথা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করি, তখনই তোমরা মনে করিবে যে, আমি বন্ধুসুলভ প্রীতি তোমাদিগকে দান করিলাম। অর্থাৎ আমার অস্বীকার করা আমার শত্রুতা ও ক্রোধের চিহ্ন বা পরিচায়ক নয়। মোট কথা, ইহা এক মাধুর্যপূর্ণ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মজমুন—এমন এক নূর, যদ্বারা আত্মসংযোগ ও দোওয়ার জগতকে আলোকিত করা হইয়াছে, সেই নূর কুরআন শরীফই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তোমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গ সম্বন্ধে আমরা এমন শিক্ষা দান করিয়াছি, যাহাকে 'ফুরকান' বলা যাইতে পারে। যদি তোমরা সেই শিক্ষার উপর আমল কর, তাহা হইলে তোমরা সেই সকল লোকের মধ্যে শামিল হইতে পারিবে যাঁহারা অন্য সকলের মুকাবিলায় স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তোমরা খোদার দৃষ্টিতেও, মানুষের দৃষ্টিতেও, আপনজনের দৃষ্টিতেও এবং অপরের দৃষ্টিতেও বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারিবে। তোমাদের জাহের ও বাতেনে, বাহির ও অভ্যন্তরে শুধু নূর আর নূরই বিরাজ করিবে, এবং এই নূর তোমাদিগকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করিবে, 'ফুরকানে' ভূষিত করিবে।

আল্লাহ্ বলেন :

نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم

(التحريم : ٩)

এই আয়াতের এক অর্থ আমরা ইহাও করিতে পারি যে, যেহেতু আমলনামা ডাহিন হাতে দেওয়া হইবে, সেইহেতু তোমরা কুরআন করীমের হেদায়েত অনুযায়ী জীবন যাপনে যে নূর হাসিল করিবে, তৎকালে তোমাদের জন্য ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্ন উন্নতির দুয়ার সমূহ খোলা হইবে এবং সেই নূর তোমাদের আমলনামায়ও লিখিত হইবে। সেই নূর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তোমরা দেখিতে পাইবে অমুক জ্যোতির্ময় কাজও তোমরা করিয়াছ, অমুক নূরানী কাজও করিয়াছ। মোট কথা, রূপকভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, শুধু এ দুনিয়াতেই তোমরা তোমাদের অগ্র ও পশ্চাতে সৃষ্টি কৃত নূর অনুসরণ করিয়া ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিবে না বরং তোমাদের আমলনামাও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে, উহার মধ্যেও সেই নূর লিপিবদ্ধ হইতে থাকিবে। যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শুধু এই দুনিয়াতেই তদনুযায়ী তোমাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে না, শুধু এ দুনিয়াতেই তোমরা আল্লাহ্তায়ালার প্রীতি ও সন্তোষের জ্যোতির্বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবে না বরং পরলোকেও তোমাদের রূহানী ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে তোমরা খোদাতায়ালার অধিকতর প্রীতি ও ভালবাসার জালওয়া সমূহের হকদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তোমাদের আমলনামাতেও ঐসব বিষয় সংযোজিত ও সুরক্ষিত হইবে।

(ক্রমশ:)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৭)

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অন্তর্হিত

পবিত্র কুরআন উঠে যাওয়া হলো আর একটি নিদর্শন। পবিত্র কুরআন উঠে যাওয়ার অর্থ হলো কুরআন করীমের শিক্ষা ও মর্মার্থ অন্তর্হিত হওয়া। কেননা, কুরআন করীমের শাব্দিক সংরক্ষণ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনেই প্রতিশ্রুতি রয়েছে (আল-কুরআন ১৫ : ১০)। কুরআন করীম অন্তর্হিত হওয়া সংক্রান্ত নিদর্শন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আগমনকারী মসীহের যামানায় পবিত্র কুরআন পথ প্রদর্শক-রূপে, জ্ঞান ও আলোর উৎসরূপে, অবহেলিত হবে। যথা সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতি লৌকিকভাবে সম্মান প্রদর্শন অবশ্যই করা হয়। কিন্তু এই পবিত্র গ্রন্থকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা, ঐশী কালাম বলে মর্যাদা দেওয়া এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিষয়। এই বিষয়টি কার্যতঃ অন্তর্হিত হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআনের তফসির সম্বন্ধে সর্বশেষ বক্তব্য পূর্বেকার তফ-সির কারকগণ পেশ করে ফেলেছেন অর্থাৎ আর কোন ব্যাখ্যা বা তফসির হতে পারে না। ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। কারণ, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা উহার নযুলের পর হতেই হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। আর কিছু ব্যাখ্যা হতে পারে না—এ ধরনের খেয়ালের অর্থ হলো পবিত্র কুর-আনের অর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের খেয়াল ঠিক নয়।

এ সম্পর্কে আরও একটি নিদর্শন ইবনে মারদাভিয়া এবং ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এই নিদর্শনটি হলো এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের প্রতি বাহ্যিকভাবে যে সম্মান দেখানো হবে তার সঙ্গে এই পবিত্র গ্রন্থের মর্মার্থ এবং মর্মবাণীর প্রতি মনোযোগ প্রদ-র্শনের সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ কাল এই পবিত্র গ্রন্থকে মহামূল্য মখমলের কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়, স্বর্ণ এবং রৌপ্য দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, কিন্তু যত্নসহকারে তথা আন্তরিকতার সঙ্গে খুবই কম লোক ইহা অধ্যয়ন করে।

অনুরূপভাবে প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে মসজিদ গুলো বাহ্যিকভাবে জাঁক-জমকপূর্ণ হওয়ার নিদর্শনও পূর্ণতা লাভ করেছে।

নৈতিক অবস্থা

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সময়ের একটি চিহ্ন হলো বর্ধিত আকারে যৌন বিকৃতি এবং অবৈধ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি পাওয়া। এই ভবিষ্যদ্বাণী ইবনে আবি শাযবা এবং আনাস ইবনে মালিক কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম শরিফের হাদিসে সংগৃহিত হয়েছে। যে যৌন পাপ সমূহ এবং যৌন বিকৃতি ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে সেগুলি আধুনিক সমাজে ভদ্রজনোচিত বলে বিবেচিত হচ্ছে। বল-রুম নাচ-গান, মেয়েদের সৌন্দর্য প্রচারনা, অপরিচিতা মেয়ে নিয়ে ছুটী যাপন, ইত্যাদি আজকাল অতি সাধারণ বিষয়ে পরিনত হয়েছে। পূর্বে এই সকল বিষয় এত বেশী সহজ-সাধ্য ব্যাপার ছিল না। প্রাচীন কালে আরব, ভারতবর্ষ ; ইরানে মূর্তি পুজা ইত্যাদি বিষয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু যৌন ব্যবহারে এতবেশী যথেচ্ছাচরিতা কখনই অনুমোদন লাভ করে নাই। প্রাথমিক যুগের রোমানদের মধ্যে যৌন-সংযম এবং শৃংখলার শিক্ষাও প্রচলন ছিল। পুরুষ এবং মেয়ে মিলিতভাবে নাচ-গানে অংশ গ্রহণ করা সেকালে অজ্ঞাত ছিল। অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীর জন্য স্থানে স্থানে বেশ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা ইতিপূর্বে অচিন্তনীয় বিষয় ছিল। একজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে অন্য একজন অপরিচিত মহিলার একত্রে বাস করার কথা পূর্বকালে এক আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক বিষয় বলে বিবেচিত হত।

সমাজ-কর্মীগণ অবৈধ সন্তানদের অধিকার সম্বন্ধে প্রায়ই লিখে থাকেন—অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা এত বেশী হয়ে গিয়েছে। অবৈধ সন্তানদেরকে প্রত্যেক দেশের সম্পদের অংশ বলে এবং প্রতিরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার কোন নযীর নেই বল্লেই চলে।

নৈতিক অবস্থার চরম অধঃপতনের আর একটি বিষয় হলো মদ ও মাদক দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। এই ভবিষ্যদ্বাণী আনাস ইবনে মালিক (মুসলিম শরীফ) এবং আবু নঈম (হোজাইফা বিন আল ইয়ামানের বরাত অনুসারে) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মদ্যপানের ব্যপক প্রসারতা লাভ করার কথা ছিল। বস্তুতঃ আজকাল তা-ই হয়েছে। পানীর চেয়ে বেশী পরিমাণে মদ পান করা হয়ে থাকে। অতীতে মদ্যপান ছিল ব্যয়-বহুল পানীয় যা সাধারণতঃ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অথবা ঔষধ রূপে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আজ-কাল মদ পান একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের সর্বস্থানে ইহা সহজেই পাওয়া

যায়। পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে এত মদের দোকান রয়েছে—মদ পানের জন্য আশে পাশেই দোকান রয়েছে অর্থাৎ, মদ্যপানকারীকে কষ্ট করে বেশী দূরে যেতে হয় না। কোন কোন স্থানে পানির চেয়ে মদই বেশী পাওয়া যায় অথবা দুটোই প্রায় এক দামে বিক্রি হয়। ইংল্যাণ্ডে কর্মরত জনৈক মুসলিম মিশনারীকে তাঁর বাড়ীর মালিক বলেছিলেন—তিনি যেন ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কালে পানি পান না করেন অর্থাৎ, যেন শুধু মদই পান করেন। বাড়ীর মালিক বলেছিলেন: "My father drank water once in his life, and he died soon after—অর্থাৎ আমার পিতা জীবনে একবারই পানি পান করেছিলেন এবং তার পরপরই মারা যান।" সেই গৃহকর্ত্তাকে যখন বলা হলো যে, তাঁর ভাড়াটে (অর্থাৎ মিশনারী) জীবনে পানি ছাড়া কখনই মদ খান নাই, তখন তাঁর পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল।

আর একটি চিহ্ন হলো—জুয়া খেলার ছড়াছড়ি। ইউরোপ এবং আমেরিকায় জুয়া খেলা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে শুধুমাত্র অবসর যাপনের বিষয় নয়, বরং সে সব দেশে জুয়াখেলা প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিরাজ করছে। ভোজ-সভাগুলোতে বাজী রেখে জুয়া খেলা একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেশব্যাপী লটারীগুলিতে অনেক টাকা আবদ্ধ করে ফলে—প্রায় এক-চতুর্থাংশ টাকা বাণিজ্যের পরিবর্তে লটারীতে লাগানো রয়েছে। ইটালীর বিখ্যাত জুয়া খেলার কেন্দ্র হলো মণ্টি কার্লো। মণ্টি কার্লোতে এক রাতে শতশত মিলিয়ন পাউণ্ড এক হাত হতে অন্য হাতে চলে যায়। অতীতেও জুয়াখেলার প্রচলন ছিল—কিন্তু আজকের জুয়াখেলার সংগে সেদিনের কোন তুলনাই হয় না। নানা ধরণের ইনস্যুরান্স বা বীমা পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো মূলতঃ জুয়াখেলারই নামান্তর। অতীতে এক বছরের জুয়াখেলার সংগে এখনকার একদিনের জুয়া-খেলার তুলনা করা যেতে পারে।

আর একটি চিহ্ন হলো সত্যিকার বিবেকবান মানুষের সংখ্যাল্পতা। এ সম্বন্ধে ইমার বিন ইয়াসির হতে নঈম বিন হাম্মাদ কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেই ধরণের সৎ লোক যাঁদের মধ্যে ন্যায়-বিচার বোধ রয়েছে, যাঁরা আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বিচার বোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন—তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে সৎ-মানুষের এই যে অভাব তা মুসলীম এবং অমুসলিম—বরং মুসলমানদের মধ্যে অধিক পরিমাণে অনুভূত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে সমাজে যাঁরা সাধু, সুফী জ্ঞান-বিজ্ঞানী এবং সম্মানী ব্যক্তিবিশেষ বলে সমধিক পরিচিত তাঁদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং অমলিনতার বড়ই অভাব। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হলো সেই চিহ্ন যা খোদা প্রেমের আকারে প্রকাশিত হয়। যদি এ ধরণের মানুষ আমাদের মধ্যে থাকতেন

তাহ'লে তাঁরা ইসলামের জন্য রুহানী জেহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা আমাদের সামাজিক এবং রুহানী দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু এমন একজনও তাঁদের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর।

অনুরূপভাবে ন্যায় ও সৎ ব্যবহার হ্রাস পেয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে (হযরত আলী রাঃ কর্তৃক বর্ণিত এবং 'দায়লমী'তে সংগৃহীত)। আধুনিক জীবনে সমাজের সকল স্তরে অকপট এবং সরল ব্যবহারের বড়ই অভাব।

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান দেখানো আজকাল হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে বন্ধু-বান্ধবের প্রতি খাতির যত্ন ও সম্মান বোধ বেড়ে গিয়েছে (বর্ণনায় আবু নঈম এবং হোজাইফা বিন আল ইয়ামান)। এই বদ-আচরণ পাশ্চাত্যের দেশ সমূহ হতে শুরু করে পূর্বাঞ্চলে এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বদেশ গুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততিগণের দুর্ব্যবহার, তাঁদের মান-সম্মানের প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রদর্শন আজকাল সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অতীতে এই ধ্যানধারণা খুবই বিরল ছিল।

বস্তুতঃ মানুষের সামগ্রিক নৈতিক অধঃপতন এ কথার সাক্ষ্য বহণ করছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যামানা সম্পর্কে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং ইহাই সেই প্রতিশ্রুত মসীহের যুগ।

(ক্রমশঃ)

('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

পবিত্র রমজান আমাদের জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি ও বিশ্ব-মুসলিমের জন্য মোবারক হউক। আমীন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তী

ঢাকা মসজিদের চাঁদা

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আস্সালামু আলাইকুম,

ঢাকার মসজিদের চাঁদার জন্য দুই দফায় তাহরীক করা হইয়াছে। প্রথম, ভগ্নিগণের নিকট এবং পরে ভ্রাতাগণের নিকট। দুই তাহরীকই হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর অনুমোদন প্রাপ্ত। ভগ্নিগণ তাহাদের কোটা প্রায় আদায় করিয়াছেন এবং অল্প বাকী রহিয়াছে। ভ্রাতাগণ সবে চাঁদা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালার ফযলে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট প্রফেসার আহ্মদী ভ্রাতা ডক্টর মীর মোবাশ্বের আলীর তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে মসজিদের নির্মান কার্য চলিতেছে।

নির্মান কার্য যথাযথভাবে গতিশীল রাখিতে সদা ফাণ্ড মজবুত থাকার প্রয়োজন। সুতরাং ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাঁহাদের উপর ধার্যাকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণে তৎপর হউন।

মসজিদের নির্মান কার্য দ্রুত সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ রমযান মোবারকে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বিশেষ দোওয়া জারি রাখিবেন। ওয়াস্সালাম।

তাং ১৪/৮/৭৭ খাকসার—মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

পবিত্র রমজান ও আর্থিক কুরবানী

তাহ্রীকে জদীদ ও ওক্ফে জদীদ

পবিত্র রমজান মাস মুমিনদের জন্য অনন্ত বরকত ও রহমত লইয়া উপস্থিত হয়। এই মাস এবাদত নেকী, কুরবানী এবং দোওয়ার কবুলিয়তের মাস। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এই মাসে সর্বপ্রকার এবাদত ব্যতীত আল্লাহ্তায়ালার পথে দান খয়রাতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন যেমন প্রবলবেগে ঝঞ্জা বায়ু প্রবাহিত হয়। (আল-হাদিস)

এ প্রসঙ্গে আহ্মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা হইতেছে তাঁহারা যেন প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও রমজানের মধ্যেই তাহরীকে জদীদ ও ওক্ফে জদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে যত্নবান হন যাহাতে তাঁহারা সেই বরকত-পূর্ণ দোওয়ার তালিকাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, যাহা ২৯ শে রমযানের বিশেষ দোওয়ার জন্য সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এর নিকট পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের চাঁদার বৎসরে যথাক্রমে ১০ম ও ৮ম মাস অতিক্রম করিতেছে। বন্ধুগণ লাজেমী ও অন্যান্য জরুরী চাঁদা আদায়ের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হইবেন। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সহায় হউন। আমীন।

—সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদ

আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar